টরোন্টোতে বেড়াতে এসে যে সি-এন-টাওয়ার (CN Tower) না দেখে ফিরে যায় তার জীবন যদি আট আনা মিছে হয়, এই শহরে ছয় বছর বাস করে যারা এই বিশ্ববিখ্যাত গগনচুম্বী কাঠামোর নাকের ডগায় ভ্রমণ করেনি তাদের জীবন বুঝি ষোল আনাই মিছে। আমরা হলাম সেই দলে। যাবো, যাচ্ছি, গেলামতো করতে করতে কিভাবে যে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলো।

যাই হোক, অধিকাংশ টরোন্টোবাসীর মতো আমাদেরও শহর ঘোরা হয় বিদেশী অতিথি এলে। তাদেরকে সঙ্গ দিতে গিয়ে নিজের পরিচিত শহরটাও একটু খুটিয়ে দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেননি - দুনিয়া ঘোরা হলো কিন্তু ঘরের পাশের ধানের ডগায় শিশির বিন্দুটাই বাদ থেকে গেলো। উপমাটা ঠিক যুতসই হলো না কারণ CN Tower কে কোন অবস্থাতেই শিশির বিন্দু বলে চালানো সম্ভব নয়। টরোন্টোর সীমান্ড্রে ধারে কাছে এলেও এই কাঠামো যে কারো নজরে পড়বে। নিকটবর্তী কোন সুউচ্চ দালানের আড়ালে না পড়লে তাকে না দেখাটা অসম্ভব।

লন্ডন (ইংল্যান্ড) থেকে আমার দুঃসম্পর্কের চাচা এবং চাচী বেড়াতে আসায় তাদের অনুরোধে এক সুপ্রভাতে আমরাও তাদের পিছু পিছু টরোন্টো ডাউনটাউন উপলক্ষ্যে রওনা দেই। স্বল্প কিছুদিন আগে স্কারবোরোর এপার্টমেন্ট ছেড়ে আমরা নিকটবর্তী শহর এজাক্সে বাড়ী কিনেছি। এখান থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি টরোন্টোর কেন্দ্রে চলে যাওয়া যায়। গাড়ীতে গেলে রাস্ড়ার গোলকধাঁধাঁতো আছেই, পার্কিংও সমস্যা।

চাচা - আব্দুল আজীজ, ব্যবসায়ী মানুষ কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধ শিল্পীর মতো। লেক ওন্টারিওর পাশ দিয়ে ট্রেন যখন সবেগে এগিয়ে চলেছে তিনি শান্ড়, সমাহিত পানির উপরে ঝিকিয়ে ওঠা সূর্যের ঝিকিমিকি দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে

গেলেন যে সবার সামনেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠলেন - ‘রূপ দেখে তোর মজলাম আমি, ও সুন্দরী। ’

চাচী - আসমা ছদ্ম কোপে ধমকে উঠলেন। ‘থামো তো। নিজে নিজে গান বানায়। ছাই ভস্ম!’

আমরা সবাই তাতে কলকলিয়ে হেসে উঠি। জাকির বাংলা যথেষ্ট ভালো নয়। সে কৌতুহলী কন্ঠে বললো,

‘হাসির কি হলো? হাসো কেন? ’

এবার চাচা-চাচী তাকে লক্ষ্য করে হেসে উঠলেন। ‘আমাদের গুলোরও একই অবস্থা।’ চাচী বললেন। ‘বাংলা বলে বিদেশীদের মতো। ’ তাদের তিনটি ছেলে মেয়ে, সবাই ইউনিভার্সিটিতে যায়। কেউ আসেনি এই সফরে।

আমার মেয়ে ফার, যে মাত্র তিনে পড়েছে, কিছু না বুঝেই সবার সাথে টেনে টেনে হাসলো। তার এই অদ্ভুত ছদ্ম হাসি দেখে আরেক ঝলক হাসি বড়দের। চমৎকার রোদ ঝলমল গ্রীষ্মের দিন। বোঝা গেলো আমাদের সবারই প্রফুল মন।

ইউনিয়ন ষ্টেশনে নেমে স্কাইওয়াক (Skywalk) ধরে আমরা টাওয়ার অভিমুখে হাঁটতে থাকি। এই প্রশস্ড় পায়ে চলা পথটি সম্পূর্ণ ঢাকা এবং শহরের কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তার যাত্রা। গ্রীষ্মে শহরের ফুটপথ দিয়ে হাঁটতে মন্দ লাগে না কিন্তু শীতের সময় ঠান্ডা এবং তুষার থেকে নিস্ড়্র পেতে হলে এই অবগুন্ঠিত পথই ভরসা। আমরা স্কাইওয়াক (Skywalk) নিয়েছি কারণ চাচা-চাচী রোদ পছন্দ করেন না।

পনেরো বিশ মিনিটের হাঁটা শেষে আমরা সুউচ্চ টাওয়ারের পাদপ্রান্ড়ে পৌঁছলাম। মুহুর্ত পরেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়ক গাছে উঠলো, হৃদয় গেলো ধরনীতলে। বাস্ড়বে দৈর্ঘ্য কতখানি হবে জানিনা কিন্তু আমার বিরস নয়নে মনে হল কম করে হলেও এক কিলোমিটার লম্বা লাইন লেগেছে টাওয়ারের টিকিট কাউন্টারে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লাম। লম্বা লাইন দেখলেই আমার সর্বশরীরে

চুলকানি শুর‍ু হয়। কিন্তু উপায় নেই। চাচা-চাচী আগেই বলে রেখেছেন দুনিয়া এস্পার ওস্পার হয়ে গেলেও তারা উপরে উঠবেন। সুতরাং লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া গতি নেই। টাওয়ারের নীচে খাবারের দোকানসহ সুভেনিরের দোকানপাট আছে। বসার সুন্দর জায়গা। শিলি চাচা-চাচী এবং সন্তানদের নিয়ে হাসি মুখে সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়লো। এই হতভাগা রয়ে গেলো টিকটিকির অন্তহীন লেজের ডগায়। ও পাষানী--- ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘন্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হয়ে, অল্প বিস্তর গুতা খেয়ে এবং দু' একটি ভদ্রোচিত গালি দিয়ে শেষ তক টিকিট কাটা গেলো। টাওয়ারে বেশ কয়েক ধরনের টিকিটের ব্যবস্থা। মুল আকর্ষণ হচ্ছে অবজারভেসন ডেক (Observation deck), কাঁচের মেঝে (glass floor), স্কাই পড (sky pod), ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্ট (যেটা আবার নিজ অক্ষের চারদিকে চক্কর দেয়) এবং হিমালামাজন - একটি মোসন থিয়েটার রাইড (motion theatre ride)। চাচা-চাচীর প্রধান আগ্রহ কাঁচের মেঝেটা দেখা এবং ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সুতরাং সেভাবেই টিকিট কাটলাম। আরাম কেদারা থেকে বাকীদেরকে টেনে তুলে ছুটলাম এলিভেটরের লম্বা লাইনের ইতি হতে। অনেকগুলি এলিভেটর আছে। আশা করছি এখানে অপেক্ষাটা কম হবে।

প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ইত্যবসরে ব্রোসিয়ারে দ্রুত নজর দুলিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত 'সিএন টাওয়ার' এর উপর যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করা গেল। ৭০ এর দশকে টরোন্টোতে প্রচুর দালান কোঠা গগণচুম্বী হয়ে ওঠায় রেডিও টেলিভিশনের সিগনাল সম্প্রসারণে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সুবাদেই এই টাওয়ারের গোড়াপত্তন। ১৯৭৩ সালে কাজ শুর‍ু হয়। শেষ হয় ১৯৭৫ এ। এন্টেনাসহ দালানটির উচ্চতা ১৮১৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। এক সময় পৃথিবীর উচ্চতম দালান হিসাবে বিবেচিত হলেও সেই সম্মান এখন দুবাইয়ে নির্মিত বার্জ দুবাইয়ের। কিন্তু সেটা ব্যতিরেকেও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ব রেকর্ড এখনও ধারণ করছে এই টাওয়ার: দীর্ঘতম ধাতব সিড়ি - ২৫৭৯ টি ধাপ; উচ্চতম কাঁচের

মেঝে - ১১২২ ফুট, উচ্চতম ওয়াইন সেলার (wine celler) - ১১৫১ ফুট, উচ্চতম অবজারভেসন গ্যালারি (observation gallery) - ১৪৬৫ ফুট। মন্দ নয়। নিজ শহরের এমন বিশ্বজয়ী প্রতাপ দেখে নিজের অজান্তেই বুকটা গর্বে কিঞ্চিৎ ফুলে উঠলো।

এলিভেটরে অবশেষে যখন পদার্পণ করার ভাগ্য হলো তখন আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো। টাওয়ারের দেয়াল ঘেষে লেগে থাকা প্রশস্ত এলিভেটরের এক পাশ সম্পূর্ণ কাঁচের। যার অর্থ তীব্র গতিতে যখন সেটি উর্দ্ধ মুখে যাত্রা করবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নীচের পৃথিবী ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। উচ্চতার প্রশ্ন যখন আসে তখন আমার চিত্ত হয়ে ওঠে দুর্বল। চারিদিকে ঢাকা এলিভেটরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকা এক কথা আর স্বচ্ছ দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সাই করে উঠে যাচ্ছি সেটা দেখা সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমি যতখানি সম্ভব পশ্চাতের দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালাম। আমার দূর্বলতার কথা শিলি জানে। সে মুচকি মুচকি হাসছে। তার আবার উচ্চতা ভীতি বলতে কিছু নেই। ছেলেমেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। ভয় পাবে কি পাবে না বোঝার চেষ্টা করছে। চাচা চাচী বেশ মজা পাচ্ছেন। বোঝা গেলো এই ধরনের এলিভেটর এটাই তাদের প্রথম নয়।

একরকম চোখের নিমেষেই ১১4 তলায় লুক আউট লেভেল (Look out level)-এ এসে থামলো এলিভেটর। একটু আগের টরোন্টো শহর ঝট করেই খেলনার শহরে পরিণত হয়েছে। চিকণ সুতার মতো রাস্তা-ঘাট, কালচে আবছায়ার মতো দালান কোঠার সারি। এখান থেকে সম্পূর্ণ শহরটার ৩৬০° দৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণে লেক ওন্টারিওর আদিগন্ত নীল জল, তার তীর বেয়ে বহমান নদীর মতো গার্ডিনার এক্সপ্রেসওয়ে চলে গেছে পশ্চিমে, উত্তরে বিশাল এক টুপির মতো দেখতে থমসন হল। সারি সারি চিকণ রাস্তার ছক পূর্ব পশ্চিম চিরে ছুটে গেছে ওন্টারিওর ব্যস্ততম সড়ক ৪০১ এ - আরেকটি এক্সপ্রেসওয়ে। কোথাও ঘন, কোথাও হালকা বসতির মাঝ দিয়ে ছুটে গেছে ৪০১, আড়াআড়ি ছেদ করেছে

আরো দু’টি এক্সপ্রেসওয়েকে - ৪০০ ও ৪০৪। চারদিকে শহরের ব্যস্ড়তা থাকলেও গাছপালা আর ছোট ছোট হ্রদে সমস্ড় এলাকাটাকে যেন প্রাকৃতিক স্বপ্নপুরীর মতো লাগে। আমরা নয়ন ভরে টরোন্টোকে দেখে নিলাম।

পরবর্তী গন্ড়ব্য ঠিক নীচতলার গাস ফ্লোর (glass floor)। চাচা চাচী আগেই মনস্থির করে এসেছেন কাঁচের মেঝেতে দাঁড়িয়ে তারা একটা ছবি তুলবেন। এখানে নেমে মেঝেটাকে দেখার পর আমার শরীর হীম হয়ে এলো দ্বিতীয়বারের মত।

কাঁচের মেঝেটির আকার ২৫৬ বর্গফুট, ৪২ ইঞ্চি বাই ৫০ ইঞ্চি-র ছোট ছোট কাঁচের প্যানেল দিয়ে তৈরী। প্রতিটি প্যানেল ২.৫ ইঞ্চি চওড়া, যার মধ্যে ১ ইঞ্চি বাতাসের স্ড়র আছে ইনসুলেশনের জন্য। প্রচন্ড মজবুত। চৌদ্দটা বিশাল দেহী জলহস্ড়িকে দিব্যি বুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু আমার আছে এক্রোফোবিয়া - উচ্চতাভীতি। আমি চোখের কোণা দিয়ে এক পলক তাকিয়েই দেয়ালে সেঁটে গেলাম। এক হাজার ফুট নীচের দৃশ্য নয়ন ভরে দেখার মতো বুকের পাটা আমার নেই। সৌভাগ্যই হোক আর দূর্ভাগ্যই হোক আমার মেয়েটির দেখলাম তার মায়ের মতই উচ্চতা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। তারা হাসি মুখে দিব্যি হিলে পটাস পটাস শব্দ তুলে কাঁচের প্যানেলের উপর দিয়ে হেঁটে মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আকর্ণ বিস্ড়ৃত হাসি হাসতে হাসতে একবার নীচে আরেকবার আমাকে দেখতে লাগলো। জাকি বার দুয়েক সাহস করে যাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলো।

আমি তাকে অস্পষ্ট কণ্ঠে ধমক দিলাম, ‘তুই এখানে কি করছিস, যা।’

সে রক্তশূন্য মুখে বিজ্ঞের মতো বললো, ‘জেনেটিক্স। আমারও উঁচু জায়গা পছন্দ না। ’

আমি মন্ড়ব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। আজকাল কাউকেই ঝাড়ি দিয়ে শান্ড়ি নেই। আট বছরের বালকও জেনেটিক্সের জ্ঞান দিচ্ছে।

চাচা চাচী কাঁচের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই যাই- এই থাকি করলেন বেশ কতক্ষণ। চাচীর দেখা গেলো ভয় অপেক্ষাকৃত কম। তিনি শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে শিলি ও ফার এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একরকম পা টিপে টিপে কাঁচের উপর হাঁটতে লাগলেন। তার কান্ড দেখে হাসি থামাতে পারলাম না।

চাচী কটমট করে তাকালেন। ' খুব যে হাসছো। নিজে তো টিকটিকির মতো দেয়ালের সাথে লেপটে আছো। '

"আমার কেস আলাদা। আপনি যেভাবে হাঁটছেন মনে হচ্ছে এই বুঝি সব ভেঙ্গে পড়লো।"

চাচী থমকে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, "বাজে কথা বলো না। ভীতুর ডিম।" চাচাকে লক্ষ্য করে, "এই এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ঐ ভীতুটাকে ক্যামেরাটা দিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, একটা ছবি তুলবো।"

চাচা আমার হাতে ক্যামেরাটা গুজে দিয়ে কচ্ছপের মতো এগুতে লাগলেন। আমাকে হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে তার আঁতে ঘা লাগলো।

"তুমি এখনও আগের মতই বেয়াদপ আছো।"

শিলি লুফে নিলো, "বলেন কি? ও খুব বেয়াদপ ছিলো?"

"দুচোখের বিষ। আমার টাক নিয়ে বিশাল এক কবিতা লিখে দেয়ালে টানিয়ে ছিলো। চিন্তা করতে পারো।"

"রমনা পার্কে কি দেখেছিলেন সেটা তো বাসায় বলবার কোন দরকার ছিলোনা।" আমি ইতিহাস ঘাঁটি।

"না বলবো না। মেয়েদের সাথে ফস্টি নষ্টি করবে.... "

"কি? কি?।" শিলির চোখ গোল হয়ে উঠেছে। "রমনা পার্কে কি করছিলো? "

আমি হাতজোড় করি। চাচা জ্বলন্ড় দৃষ্টি মেলে বললেন, “সে সব কবেকার কথা, সব মনেও নেই। ঠাট্টা করছিলাম। বেয়াদপটাকে যদি আবার হাসতে শুনি তখন হয়তো মনেও পড়ে যেতে পারে।”

“না না ঠাট্টা নয় ”, শিলি কপাল কুঁচকে বললো। “রমনা পার্কে ফষ্টি নষ্টি করতো?”

আমি ক্যামেরা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রমনায় ফষ্টি নষ্টি করবার কপাল নিয়ে কি জন্মেছিলাম। তিন সহপাঠিনীকে নিয়ে শটকাট মারবার সময় হঠাৎ এই চাচার চোখে পড়ে যাই। কিছু একটা নিয়ে হৈ হলা হচ্ছিলো, কোন এক সহপাঠিনী হয়তো একটু ঢলে পড়েছিলো - ব্যস, তাই নিয়ে তুমুল কান্ড হয়ে যায়।

আজীজ চাচা তার কচ্ছপ যাত্রায় ইতি টেনে চাচীর পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালেন। আমি দ্রুত বার কতক ক্যামেরার শার্টার টিপলাম। শিলি কটমট করে তাকিয়ে আছে। ফার ছবি তোলার পাগল। সে নানান ধরনের পোজ দিতে দিতে চিৎকার করছে, ‘ আমার ছবি তোল, পিজ। ’

সেখান থেকে বেরিয়ে আরেকটি এলিভেটরে চড়ে স্কাইপড (Skypod) এ এলাম আমরা। ১৪৬৫ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই স্ড়রটি আকারে সাত তলা একটি দালানের মতো। ‘সিএন টাওয়ার’ CN Tower এর মার্কা মারা চাকতি আকারের অবয়বগুলি এই স্ড়রেই অবস্থিত। এখানে রয়েছে দু’টি অবজারভেসন ডেক (observation deck), ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্ট (যেটি ৭২ মিনিটে নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে), এবং বেশ কিছু যান্ত্রিক এলাকা যেখানে টাওয়ারের মূল কার্যক্রম ট্রান্সমিশন ব্রডকাস্ট সংক্রান্ড় বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমগ্র অবস্থিত। এক কথায় স্কাইপড (Skypod) হচ্ছে সম্পূর্ণ টাওয়ারটির - একটু অলংকরণ করে বলা যায় - মুকুট।

রেস্টুরেন্টে ঢুকবার ইচ্ছা আমার কিংবা শিলির ছিলো না। বেশ সৌখিন রেস্টুরেন্ট, হাল্কা পকেট নিয়ে দুঃসাহস না দেখানই ভালো। ভ্যাঙ্কুভারে আমরা

দু'জন একবার সেখানকার ঘুর্ণমান রেস্টুরেন্টে পদার্পণ করেছিলাম। চমৎকার পরিবেশনা, অপূর্ব দৃশ্য, নিদারুণ অভিজ্ঞতা, স্বল্প খাদ্য, দুর্দান্ড় মূল্য। এখানেও তার অন্যথা নয়। তবে এই অভিনব অভিজ্ঞতার জন্য সামান্য মূল্য দেয়াটা একেবারে অবিবেচকতা নয়। ন্যুনতম পঞ্চাশ ডলারে টরোন্টোর পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখতে দেখতে নরম আলোয় খাওয়াটা টুরিষ্টদের কাছে বাঞ্চনীয় মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। চাচা চাচী আমাদেরকে খুব সাধাসাধি করলেন কিন্তু আমরা নানান অজুহাত দেখিয়ে বিদায় নিলাম। তারা দু'জন রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলেন। কথা হলো আমরা বাসায় ফিরে যাবো, তারা পরে ট্যাক্সিতে চলে যাবেন। ফিরবার আগে আমরা অবজারভেসন ডেক (observation deck) এ একটা হাজিরা দিয়ে গেলাম। ১৪৬৫ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই অবজারভেসন ডেকটি পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম বলে পরিগণিত। আমরা ডেকের চারদিকে ঘুরে ঘুরে টরোন্টোকে আরেক নজর দেখে নিলাম। পরিষ্কার আকাশ থাকলে এখান থেকে নাকি ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নায়েগ্রা জলপ্রপাতও দেখা যায়। আজ অবশ্য দেখা গেলো না।

ফিরতি পথে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লো। তাদের মা দীর্ঘক্ষণ নীরব। কারণটা বুঝতে বাকী নেই। তবুও ভনিতা করে বললাম, "এতো চুপচাপ কেন? অন্য সময় তো কথার ফুটানীতে টেকা দায়।" খোঁচাটা ইচ্ছে করেই দেয়া। নীরবতা ভাঙ্গার মোক্ষম অস্ত্র।

কুঞ্চিৎ কপাল, বিরক্ত মুখ, ' ছিঃ ছিঃ। আগে জানলে.... '

সাধারণ জ্ঞান থেকে জানি হাসাটা হবে ভয়াবহ ভুল। কথা বলবার সাহসও হলো না। জন সমক্ষে বেইজ্জতি হবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাছাড়া স্ত্রীর কাছে বিবাহপূর্ব জীবনের একটা রঙিন চিত্র অংকিত হলে তাতে মন্দের চেয়ে ভালোই বেশী। তার জানা থাকা ভালো আমার কদর বিবাহ পূর্ব জীবনে যথেষ্টই ছিলো। সি-এন-টাওয়ার (CN Tower) দেখতে যাওয়াটা নিতান্ড় বৃথা গেল না।